

বুবুনী কোথায়

সানজিদা সিদ্দিকী কথা





বুবুনীদের এই বাসাটা একটা অদ্ভুত বাসা। এই বাসার সবারই মনে হয় মাথায় একটু সমস্যা আছে। সারাক্ষণই কোনো না কোনো শব্দ হচ্ছে, কেউ না কেউ চিৎকার করছে, কিছু একটা ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে, ফুলমতি গলা ফাটিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে—আজকেই এই বাসায় তার শেষ দিন। এমন বাসায় কোনো মানুষ কেন, কাউয়ার ছাও-ও কাজ করতে পারবে না। সব কিছুর মধ্যে ফুলমতির কাউয়ার ছাও-এর কথা কেন মনে হলো আল্লাহ্ জানে। হতে পারে কাকের শব্দ অত্যন্ত কর্কশ।

সবার মধ্যে একমাত্র চুপচাপ হচ্ছে বুবুনীর বড় ভাই মৃদুল। মৃদুল সামনের বছর এসএসসি পরীক্ষা দিবে। মৃদুল সারাক্ষণই পড়ালেখা করে। চশমা ছাড়া ও প্রায় কিছুই দেখতে পায় না। হ্যারি পটারের মতো গোল কালো রঙের চশমা চোখে দেয়াতে এইপাশ থেকে চোখ দুটোকে অসম্ভব বড় দেখায়। দেখেই কেন জানি খুব মায়া লাগে।

বুবুনী ছাড়া মৃদুল কারো সাথেই হু হা ছাড়া তেমন কিছু বলে না। সেজন্য মৃদুলের মা তাসনিম প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর বাবা তন্ময় সাহেবকে বলেন,

ষোল বছরের একটা ছেলে সব সময় উচ্ছল থাকবে, অথচ মৃদুলকে দেখো, দেখে মনে হয় ষাট বছরের বুড়া। কোনো ডিম্বাশ্রু নেই,

খিদা লাগলে কিছু বলে না, ব্যথা পেলে কিছু জানায় না, স্কুলে মার
খেয়ে এসেও বাসায় চুপচাপ মাথা নিচু করে টেবিলে বসে থাকে।
ওকে নিয়ে করবো টা কী বলো তো?

তন্ময় সাহেব তখন হয়তো মোবাইলে খালিদ মুহিউদ্দিনের কোনো
টকশো দেখছেন, তার মাঝেই বউয়ের কথার উত্তরে বলেন,

-হু, বড়ই চিন্তার বিষয়।

তখন হয়তো তাসনিম আবার বললেন, ভাবছি কোনো কাউন্সিলরের
কাছে নিয়ে যাবো কী না!!!

তখনও মৃদুলের বাবা নাকের ডগার চশমাটা আঙুল দিয়ে আরেকটু
উঁচু করে টকশোর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে বলবেন,

-বড়ই চিন্তার বিষয়।

সাথে তাসনিমের মেজাজটা ইন্ডাকশন চুলার ২২০০ ডিগ্রী তাপের
মতো গরম হয়ে যাবে। আর তন্ময় সাহেবের হাত থেকে মোবাইলটা
থাবা দিয়ে বিছানায় ফেলে বলবেন,

-তোমার জন্যই মৃদুল এরকম হয়েছে। সারাটা ক্ষণ চোখে একটা
চশমা ঝুলিয়ে টকশো শুনতে থাকে। আর আমি কিছু বললে বলো,
হু, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়!! সংসারে কোনো মন আছে তোমার।
মৃদুল কোন ক্লাসে পড়ে তুমি জানো? আমি দেখেই তোমার সংসার
করছি। তাও করতাম না। এই বাচ্চাকাচ্চাগুলোর মুখের দিকে
তাকিয়ে। অসহ্য।

বুবুনীর মায়ের মেজাজ যখন খুব খারাপ হয় তখন বুবুনীর বাবা
অসহায় চোখে বুবুনীকে খুঁজতে থাকেন। বুবুনী সেটা জানে।

বুবুনীর বয়স নয় বছর হলে কী হবে, ওর মধ্যে একটা মা মা ব্যাপার

আছে। কারো কিছু লাগবে কী না জিজ্ঞেস করছে, নিজে থেকে চিন্তা ভাবনা করে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। মায়ের মাথায় ছোট ছোট হাতে তেল লাগিয়ে দিচ্ছে, তো বাবার হাত-পা পাড়িয়ে দিচ্ছে। দাদীর পা টিপে দিচ্ছে, আবার কখনও ফুপুমার পায়ে লোশন দিয়ে দিচ্ছে। বুবুনীর মা যখন ওর বাবার ওপর রেগে ফায়ার হয়ে যায়, তখন প্রায়ই বুবুনী হলুদ রঙের ভ্যাসলিন লোশনের বোতলটা নিয়ে আস্তে আস্তে মায়ের কাছে যায়। তারপর তাসনিমের পা দুটো টেনে নিয়ে নরম হাতে মেখে দেয়। আস্তে আস্তে তাসনিমের রাগ পড়ে যায়। বুবুনীর বাবা তখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। বুবুনী বাবার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন মা-মুরগী তার বাচ্চার দিকে তাকাচ্ছে।

আজকে মৃদুল বুবুনীর বাবা দুপুর দুইটার দিকে বাড়ি ফিরেছে। রাস্তার অবস্থা নাকি ভালো না। সারাদেশে ছাত্রছাত্রীরা বেশ কিছুদিন যাবৎ কোটা নিয়ে আন্দোলন করছে। তারা চায় মেধার ভিত্তিতে মানুষ চাকরি পাবে। কোনো কোটাফোটা দিয়ে মানুষ কেন চাকরি পাবে!! এই দেশের সরকার কিছুদিন আগে এক অদ্ভুত নিয়ম করেছে, সেই নিয়মে নাকি মেধা ছাড়াই একশ জনের মধ্যে ছাপ্পান্ন জন চাকরি পেয়ে যাবে। বিষয়টা এমন যে কোন একটা সরকারি চাকরিতে যদি একশ জন চাকরি পায়, এর মধ্যে তিরিশ জন মানুষের বাবা কিংবা দাদা বা নানা যদি একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ করে থাকে, তারাই শুধু পাবে, বাকী দশজনকে অবশ্যই মহিলা মানুষ হতে হবে, এর মধ্যে তাদের থেকেও মেধাবী পুরুষ মানুষও যদি থাকে কোনো লাভ নাই। আরো দশজন এরকম যে, দেশের যতগুলো জেলা আছে প্রতিটা জেলা থেকে দশজন মানুষ থাকতেই হবে—হোক তারা গাধা, আর বাকী পাঁচ জন মানুষকে অবশ্যই উপজাতি হতে হবে। আর একজন

মানুষকে অতি অবশ্যই প্রতিবন্ধী হতে হবে। তাহলে বাকী থাকে মাত্র চ্যাম্প্লিশ জন, যারা সাধারণ মানুষ, যারা মেধার লড়াই লড়বে।

তাই ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারের কাছে দাবী তুলেছে, চাকরি পাবে শুধুই মেধার ভিত্তিতে; আর কিছু কোটা নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তা হবে খুবই প্রয়োজনীয়।

তন্ময় সাহেবের কাছে পুরো বিষয়টা যথেষ্ট ঠিক লেগেছে। এই যে এত এত ছাত্র, এরা সারাজীবন এত কষ্ট করে পড়ালেখা করেছে, কেউ কেউ খুব গরীব হয়তো ছাত্র পড়িয়ে টাকা ইনকাম করে পড়ালেখার খরচ চালিয়েছে, কারো বা কৃষক বাবা তার ফসলের জমি বিক্রি করে দিয়ে ছেলেমেয়েকে পড়ালেখা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। তাদের অনেকের খুব মেধা আছে, ভালো রেজাল্ট আছে, কিন্তু তারা সরকারি চাকরি করতে পারবে না। কারণ তাদের বাবা-দাদারা মুক্তিযুদ্ধ করেন নাই, কিংবা সে জেলার বাইরে পড়ে গেছে অথবা সে মেয়ে না, প্রতিবন্ধী না।

মৃদুল-বুবুনীর বাবা বাসায় এসেও এসব নিয়েই ভাবছিলেন। রাস্তায় প্ল্যাকার্ড হাতে অনেক তরুণ ছেলেমেয়েদের উনি দেখেও এসেছেন। সেই সময় গর্বে উনার বুকটা ভরে উঠেছে। দেশের এই ভয়াবহ সময়ে, যেখানে সরকারের ভয়ে মানুষ দুইটা কথা বলতে পারে না, বাইরে বের হলে সরকারের অপকর্মের কথা বন্ধুদের সাথে গল্প করতে গেলেও ভয়ে ভয়ে আশেপাশে তাকাতে হয়, এই বুঝি কেউ শুনে ফেললো, এই বুঝি পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলো, ফেইসবুকে একটা পোস্ট দেয়া যায় না, সরকার দলের কেউ যদি দেখে ফেলে রাত-বিরাতে বাসায় এসে তুলে নিয়ে যায় সেখানে এই কম বয়সী মানুষগুলো যে সাহস করে রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে প্রতিদিন, এটার জন্য গর্বে তো বুকটা ভরে ওঠারই কথা।

বাচ্চাগুলোর জন্য খুব চিন্তাও হচ্ছে তন্ময় সাহেবের। কখন যে কাকে ধরে নিয়ে গায়েব করে দেয়, মেরে-ধরে ফেলে রেখে দেয় এর নাই ঠিক। শাওয়ার নিতে নিতে উনি ভাবছিলেন আজকে দুই রাকাত নামাজ বাড়তি পড়তে হবে বাচ্চাগুলোর জন্য। এদের জন্য আলাদা করে দোয়া করা দরকার।

গোসল থেকে বের হতেই বুবুনী সাদা রঙের একটা ফতুয়া নিয়ে হাজির।

-বাবা তোমার গায়ে অল্প করে একটু তেল দিয়ে দিই? এরপর ফতুয়া পরো?

এখন জুলাই মাস। ভালোই গরম। কিন্তু বুবুনী এত মায়া করে বলছে যে, ওর বাবা কিছুতেই মানা করতে পারলো না।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা টুলটার মধ্যে বসলো।

-অল্প করে দিস মা। এখন গরমের দিন তো, বেশি দিলে গরম লাগবে।

-তাহলে বাবা ফ্রিজের লোশন লাগিয়ে দিই? মা একটা লোশন ফ্রিজে রেখেছে। আমি একটু বের করে দেখেছি। কী ঠান্ডা। ওইটা দিলে গরম লাগবে না।

-না না বুবুনীসোনা। খবরদার তোর মায়ের জিনিস ধরবি না। আমাকে তুই বরং তোর হাতের তেলটাই লাগিয়ে দে। কম দেয়া লাগবে না। বেশি বেশি করেই লাগিয়ে দে।

বুবুনী হি-হি করে হাসলো। হাসলে বুবুনীর বাম গালে টোল পড়ে। তন্ময় সাহেব ভাবছেন, এই মেয়েটা উনার! কী আশ্চর্য কথা! কীভাবে যে আল্লাহর শুকরিয়া করবেন উনি ভেবেই পান না। মৃদুল বুবুনীর মায়েরও বাম গালে টোল পড়ে।

-বাবা, তুমি মাকে এত ভয় পাও কেন?

-কই আবার ভয় পেলাম। পাই না তো, একদম পাই না তো।

এর মধ্যে তাসনিম এসে ঘরে ঢুকলেন।

-বাপ-মেয়ে কী গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে শুনি। টেবিলে খাবার দিয়েছি। আন্মা বসে আছেন তোমার সাথে খাবেন বলে। একটা পুরুষ মানুষের গোসল করতে লাগার কথা খুব জোর দশ মিনিট। আমি এর মধ্যে তিনবার এসে ঘুরে গেলাম। তুমি এতক্ষণ কবোটা কী? বাথরুম কি ফুলের বাগান?

এই কথা শুনে বুবুনী এত মজা পেল যে বলার মত না।

-ছাত্রছাত্রীগুলো.... কী ভাবছিলাম বুঝলে তাসনিম।

তাসনিম মুখ ঝামটা দিয়ে বললো,

-খাওয়ার পর দয়া করে এইসব ভাবলে ভালো হয় না?

এরপর ধরাম ধরাম করে হেঁটে চলে গেলেন। তন্ময় সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বোকা বোকা একটা হাসি দিলেন।

-তোর মা একটা খুব ভালো মেয়ে, তোর মতই বুঝলি বুবুনী। সারাদিন অনেক কাজ করে তো, সবার খেয়াল রাখে এইজন্য মাথাটা একটু গরম থাকে।

-আমি একশবার জানি বাবা। আমার মা হচ্ছে সব থেকে ভালো মা। আর আমার বাবা হচ্ছে সব থেকে ভালো বাবা।

বুবুনী ছোট ছোট তুলতুলে হাতে বাবার গায়ে তেল মেখে দিয়ে বললো,

-এইবার তোমার ফতুয়া পরে নাও বাবা। এখন খেতে না গেলে মা কিন্তু আবার। হিহিহি।

-তুই তো দিন দিন দুষ্ট হচ্ছিস, চল চল।

বলেই বুবুনীর বাবা বুবুনীর লম্বা লম্বা চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিলো।

সবাই যখন টেবিলে বসে গেলো তখন ফুলমতি এসে সজনে-দেয়া ডাল বুবুনীর সামনে রেখে বললো,

-আগে ডাইল খাবা, পরে সাজনা চাবায় চাবায় খাবা। আগেই সাজনা খাইয়া পেটটা ভরায় ফেলবা না।

-আচ্ছা ফুলমতি খালা।

মৃদুল আইড় মাছের টুকরা থেকে চামড়া আর তেল আলাদা করে আস্তে করে বোনের প্লেটে তুলে দিলো। মাছের চামড়া গলায় গেলে ওর বমি আসে, অথচ বুবুনী চামড়া খেতে খুব ভালোবাসে। মাছ জিনিসটাই মৃদুলের ভালো লাগে না। কিন্তু এক টুকরো মাছ না খেলে মৃদুলের মা ওকে গরুর মাংস খেতে দিবে না। তাই বাধ্য হয়ে মাছ গিলতে হচ্ছে। বুবুনী লক্ষ্মী মেয়ে। মা যা খেতে দেয়, ও তা-ই খেয়ে নেয় চুপচাপ।

সবার প্লেটে খাবার তুলে দিয়ে তাসনিম নিজের শাশুড়ির পাশের চেয়ার টেনে বসে গেলো।

-মা, চশমা কোথায় আপনার; পরে ঠিকঠাক দেখতে না পেয়ে মাছের কাঁটা বিঁধে যাবে তো!

মৃদুলের দাদি বাচ্চাদের মত হাসলো।

-বয়স হয়েছে মা, মনে থাকে না সব। এখন আমাদের চশমা মাথায় দিয়ে চশমা খোঁজার বয়স।

-আচ্ছা বাবা তুমি জানো দেশে অনেক গণ্ডগোল হচ্ছে? অনেক ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে?

মৃদুল খাওয়ার টেবিলে সাধারণত হু হা ছাড়া তেমন কথাই বলে না।
হঠাৎ এই কথা শুনে তন্ময় সাহেব খুবই অবাক হয়ে গেলেন।

-হচ্ছে তো, তুই কীভাবে জানলি এসব কথা?

মৃদুল চুপ হয়ে গেলো। এখন ও কিছুই বলবে না।

-তুই জানিস এইটা কীসের আন্দোলন?

-কোটা আন্দোলন। এইটা মানে যারা বেশি এলিজিবল তারাই চাকরি পাবে। সবাই যে এই আন্দোলনে নামতই এমন না। কয়েকটা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সরকার-দলের ছাত্ররা আর পুলিশরা মিলে মেরেছে। অনেককে ধরে নিয়ে গেছে, এইজন্য সারাদেশের সব ছাত্ররা মিলে ডিসিশন নিলো যে, সবাই একসাথে আন্দোলন করবে।

তাসনিম আর তন্ময় দুইজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

তাসনিম মৃদুলের প্লেটে কয়েক টুকরা গরুর মাংস আর একটা নরম দেখে বড় আলু তুলে দিলেন।

মৃদুল অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছে।

-দাদাভাই আরেকটু ভাত নে। এখন বড় হচ্ছিস, এই যে একটু একটু গোঁফ দেখা যায়, দুই একটা দাড়িও দেখা যাচ্ছে। এদেরকে পেলে-পুষে বড় করার জন্যও তো একটু বেশি করে খাওয়ার দরকার।

মৃদুল লজ্জা পেয়ে গেলো। যেন দাড়ি-গোঁফ হওয়া একটা লজ্জার বিষয়।

মৃদুল কখনও ক্লাস বাংক করে না। কিন্তু আজকে খুব জরুরী একটা বিষয়ের জন্য মৃদুল আর শিশির ওদের স্কুলের বড় মাঠের কোণায় যে একটা বাবলা গাছ আছে তার নিচে এসেছে। এখন ওদের ক্যামিস্ট্রি ল্যাব চলছে। আনোয়ার স্যার মৃদুল আর শিশিরকে দেখতে না পেলে খবর আছে, কিন্তু কী আর করা। এখানে আরো কিছু ছেলেপেলেও আছে। ওদেরকে ডেকেছে লেদু বকর।

ওদের স্কুলটা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত, স্কুল এন্ড কলেজ আরকি। লেদু বকর গত দুই বছর ধরে ইন্টারে ফেল করেছে। এইবার তৃতীয়বারের মতো ইন্টার পরীক্ষা দিবে। সে খুব ভালো ডিবেট করে, ক্রিকেট আর ফুটবল চ্যাম্পিয়ন। এর মধ্যে দেশের সব খবর সে রাখে। লেদু বকর বড় হয়ে রাজনীতি করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওইদিনও ক্যান্টিনে দেশের আন্দোলন নিয়ে কথা বলার সময় বলছিলো,

—দেশ চালায় সব চোর বাটপারা। আমি কোনোমতে ইন্টার পাশ করে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যেতে পারলেই রাজনীতি শুরু করে দেব, বুঝলি? এরপর একদিন লেদু বকর দেশের চেহারা বদলায় দিবে।

সবাই লেদু বকরের কথা শুনে সেদিন মুখ টিপে টিপে হাসি আটকানোর চেষ্টা করছিলো। শিশিরটা ফিচ করে হেসে দিলো। আর অমনি লেদু বকর রেগে ফায়ার।

—তুই আউট। তুই দল থেকে একদম আউট। যা ভাগ।

চুপচাপ থাকা মৃদুল তাড়াতাড়ি বকরের কাছে মাফটায় চেয়ে কোনোমতে মানিয়েছিলো।

লেদু ভাই বড় বড় পা ফেলে এদিকে আসছে। হাতে একটা বড় মোজোর বোতল। ইজরায়েলি জিনিস বয়কটের পর থেকে লেদু ভাই